গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ১ সংখ্যা : ২
জুলাই ২০১০

ইলা মিত্র

ইলা মিত্র

১৯৫০ সালের ৭ জানুয়ারি সাঁওতালবেশ ধারণ করে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। ভারত সীমানা পার হবার প্রস্তুতিকালে তিনি রোহনপুর রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে যান। তাঁকে ধরে আনা হয় নাচোল স্টেশনে। পুলিশ শুরু করে পাশবিক অত্যাচার। তাঁকে উপর্যুপরি নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো। কারণ যেভাবেই হোক স্বীকার করাতে হবে পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবল হত্যার পিছনে তাঁর ইন্ধন ও পরিকল্পনা ছিল। নারী হিসাবে তাঁকে সামান্য সম্মান দেখানো হয়নি বরং একজন নারী, তার ওপর তিনি হিন্দু-কমিউনিস্ট নারী, এজন্য অত্যাচারের মাত্রা ছিল আরো বেশি। টানা চার দিন প্রচন্ড অত্যাচারের পর নাচোল স্টেশন থেকে তাঁকে নবাবগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে আনা হয়। সে সময় তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল, গায়ে ছিল অসহনীয় জ্বর। তবুও তাঁর উপর নির্যাতন থেমে থাকে নি। তাঁর ওপর যেসব অত্যাচার চালানো হয় তার মধ্যে ছিল- অনাহারে রাখা, শরীরের নাজুক অংশে বুটের আঘাত, পায়ের গোড়ালি দিয়ে লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া ইত্যাদি। কিন্তু শত অত্যাচারের পরও তাঁর স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি শোষক শ্রেণী। এই মহিয়সী নারী শোষক শ্রেণীর শত অত্যাচারের মুখেও থেকেছেন অনড়।

সম্পাদকীয়

নতুন প্রজন্ম এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার, যারা কাঁধে তুলে নেবে এদেশ গঠনের গুরু দায়িত্ব। জাতি হিসেবে তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার। আর তাই 'গুণীজন' কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষুদ্র চেষ্টা আমাদের।

আমাদের দেশে অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা সারাজীবন তাঁদের সৃজনশীল চিন্তা, মনন ও মেধা দিয়ে শান্তি, মানবতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন ও করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের লেখনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করছেন। অনেকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির এইসব গুণীব্যক্তিবৃন্দকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রয়াস আমাদের এই 'গুণীজন' উদ্যোগ। 'গুণীজন' উদ্যোগটি ইন্টারনেট, বই, সিডি এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে গুণীজনদেরকে পরিচিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'গুণীজন' ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.gunijan.org.bd.

'গুণীজন' (www.gunijan.org.bd.) ওয়েব জার্নালে রয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, গণমাধ্যম, মানবাধিকার, নারী অধিকার আন্দোলন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মুক্তিসংগ্রাম, ক্রীড়া, আদিবাসী অধিকার আন্দোলন ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র, 'সমসাময়িক' বিষয় নিয়ে তাঁদের অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। এছাড়া আরো রয়েছে গুণীজনদের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

'গুণীজন' কর্মসূচি মূলত স্বেচ্ছাশ্রম ও ব্যক্তিপর্যায়ের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত, কোন বিদেশী দাতাসংস্থার অর্থে পরিচালিত নয়। বিভিন্ন দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে ধীরে ধীরে আগ্রহ প্রকাশ করছে ও সহায়তা করছে। ফরাসী দূতাবাস এই ওয়েবসাইটের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

গুণীজন ওয়েবসাইটে এপর্যন্ত প্রায় ২০০ জন গুণীজনের জীবনী প্রকাশ করা হয়েছে। জীবনীর সাথে সংযোজন করা হয়েছে দুর্লভ সব আলোকচিত্র, অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। কাজ চলছে আরো একহাজারেরও বেশী গুণীজনকে নিয়ে।

যেহেতু বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটছে ধীর গতিতে, তাই বিভিন্ন মাধ্যমে 'গুণীজন'-এর প্রসার বাড়ানোর প্রয়াস চলছে। স্কুল কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকার বাইরে শিশু-কিশোরদের কাছে গুণীজনবৃন্দকে পরিচয় করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একাজে ডি.নেটের গ্রামীণ স্কুল ভিত্তিক 'কম্পিউটার শিক্ষা কর্মসূচি' ও খেলাঘরের সাথে 'গুণীজন' স্কুল কর্মসূচি যৌথভাবে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, বাংলা ভিশন, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ,রহিম আফরোজ বাংলাদেশসহ আরও বিভন্ন প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গুণীজন কর্মসূচিকে সহযোগিতা করেছে এবং করছে।

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে 'গুণীজন' কর্মসূচিটি 'ওয়ার্ল্ড সামিট অ্যাওয়ার্ড ২০০৯'-এ বিশেষ পুরষ্কার পেয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে নমিনেশন প্রাপ্ত ৬০ টিরও বেশী কর্মসূচির মধ্যে ই-কালচার এন্ড হেরিটেজ বিভাগে 'গুণীজন' কর্মসূচির স্থান ছিল ষষ্ঠতম। মনথন অ্যাওয়ার্ড, ২০০৮-এ গুণীজন কর্মসূচি নমিনেশন পেয়েছিল।

'গুণীজন' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করার জন্য চার জন (ইলা মিত্র, জুয়েল আইচ, রাবেয়া খাতুন, শামসুর রাহমান) গুণীজনের জীবনী নিয়ে 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

গুণীজনদের পরিচিতি দেশব্যাপী বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ায় হলো 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য।

সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'গুণীজন' পত্রিকাটির যাত্রা শুভ হোক। নতুন প্রজন্মের মাঝে গুণীজনদের পরিচিতি ছড়িয়ে দেওয়ার যে উদ্যোগ গুণীজন কর্মসূচি নিয়েছে তা সফল হোক, এই প্রত্যাশা রইলো সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে।

তিনি ইলা মিত্র। তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী, বাংলার কৃষকের রাণীমা। বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকের অধিকার আদায়ে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন। বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি স্বেচ্ছায় জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন। ভোগ করেছেন অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু থেমে যায়নি তাঁর আদর্শের লড়াই। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য লড়ে গেছেন এই সংগ্রামী, মহিয়সী নারী।

এই সংগ্রামী নারী ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় ইলা সেন। তাঁর বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন বৃটিশ সরকারের অধীন বাংলার একাউন্টেন্ট জেনারেল। তাঁদের আদি নিবাস ছিল তৎকালীন যশোরের ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে। বাবার চাকুরির সুবাদে তাঁরা কোলকাতায় থাকতেন। এ শহরেই তিনি বেড়ে ওঠেন, লেখাপড়া করেন কোলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজে। পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। কৈশোরে তিনি খেলাধুলায় তুখোর ছিলেন।

১৯৪৫ সালে ইলা সেনের বিয়ে হয় দেশকর্মী কমিউনিস্ট রমেন্দ্র মিত্রের সাথে। রমেন্দ্র মিত্র মালদহের নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার মহিমচন্দ্র ও বিশ্বমায়া মিত্রের ছোট ছেলে। বিয়ের পর বেথুনের তুখোর ছাত্রী ইলা সেন হলেন জমিদার পুত্রবধু ইলা মিত্র।

বৃটিশ শাসনামলে জোতদাররা পত্তনি প্রথার মাধ্যমে জমিদারদের কাছ থেকে জমি পত্তন বা ইজারা নিত। এই জোতদার শ্রেণী কৃষকের জমি চাষ তদারকি ও খাজনা আদায়ের কাজ করতো। ফসল উৎপাদনের সম্পূর্ণ খরচ কৃষকেরা বহন করলেও যেহেতু তারা জমির মালিক নন সে অপরাধে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তুলে দিতে হতো জোতদারদের হাতে। খাজনা আদায়ের জন্য জোতদাররা কৃষকদেরকে দাসের মতো ব্যবহার করত।

জমিদার-জোতদারদের এই শোষণ কৃষকের মনে বিক্ষোভের জন্ম দেয়। এই বিক্ষোভকে সংগঠিত করে ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় 'সর্ব ভারতীয় কৃষক সমিতি'। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উদ্যোগে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব দেয় 'ফাউন্ড কমিশন'। এই কমিশনের সুপারিশ ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে চাষিদের সরাসরি সরকারের প্রজা করা এবং চাষীদেরকে উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুইভাগের মালিকানা প্রদান করা। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের আন্দোলনের জন্য কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে।

১৯৪২ সালে সমগ্র বাংলায় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকের ওপর শোষণের মাত্রা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এসময়কার অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে মরিয়া হয়ে ওঠে শোষিত কৃষকেরা। তিনভাগের দুইভাগ ফসল কৃষকের- এই দাবি নিয়ে বেগবান হয় তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭ সালে দিনাজপুরে কমরেড হাজী দানেশের প্রচেষ্টায় সূচিত হয় এক যুগান্তকারী তেভাগা আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রান্তিক চাষিদের সংগঠিত করে আন্দোলনকে জোরদার করতে থাকে। পার্টি থেকে রমেন্দ্র মিত্রকে গ্রামের কৃষক সমাজের মধ্যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে কোলকাতা থেকে নিজ গ্রাম রামচন্দ্রপুর হাটে পাঠালে স্বামীর সাথে ইলা মিত্র সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন।

পাকিস্তান হবার পর সরকারের দমননীতির ফলে কমিউনিস্ট ও কৃষক আন্দোলনের নেতারা আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন। ইলা মিত্র নাচোলের চ ীপুর গ্রামে আত্মগোপন করেন। নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে ছিল সাঁওতাল নেতা ও প্রথম সাঁওতাল কমিউনিস্ট মাতলা মাঝির বাড়ি। সাঁওতালদের মধ্যে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। ইলা মিত্র ও রমেন্দ্র মিত্র এই মাতলা মাঝির গোপন আশ্রয়ে থেকে চণ্ডীপুর গ্রামে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯৪৯ সালে তাঁদের নেতৃত্বে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক সংগঠিত হয়। সকলে মিলে জোতদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে জোতদার, মহাজনদের দল। এ বছর কৃষকের ধান জোতদারদের না দিয়ে সরাসরি কৃষক সমিতির উঠোনে তোলা হয়। ফলে কোথাও কোথাও সংঘর্ষ দেখা দেয়। নাচোলে সাঁওতাল ও ভূমিহীনদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী তীরন্দাজ ও লাঠিয়াল বাহিনী। এভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ইলা মিত্র ও রমেন্দ্র মিত্র নাচোল অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের বাস্তব রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন।

এভাবেই ১৯৫০ সালে জোতদার ও ভূমি মালিকেরা নাচোলের ভিতর এবং আশেপাশে তেভাগা বাস্তবে কার্যকর করতে বাধ্য হলো। মালিকপক্ষ বাধ্য হয়ে তখনকার মতো এক তৃতীয়াংশ ফসল গ্রহণ করলেও প্রশাসনের কাছে নালিশ করা থেকে থেমে থাকেনি। ভূমি মালিকরা এই তেভাগা প্রথাকে অকার্যকর করার চেষ্টা চালাতে লাগলো। ভূমি মালিক, জোতদার ও জমিদারদের সম্মিলিত আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকার এই আন্দোলনকে লুঠতরাজ, সন্ত্রাস এবং বিশৃঙ্খলা তৈরির অপবাদ দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। সরকারের পুলিশ বাহিনী গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। নিরীহ অসহায় কৃষকের ওপর অত্যাচার চালানো শুরু হয়। হাতের নাগালে যাকে পায় তাকেই জেলে বন্দি করে রাখে।

১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি পুলিশ বাহিনীর একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে একদল কনস্টেবল নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে আসে। গ্রামবাসী সংগঠিত হয়ে পুলিশ বাহিনীকে পাল্টা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে উন্মত্ত গ্রামবাসী ওই পুলিশ কর্মকর্তা ও পাঁচ জন পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করে। ঘটনার দু'দিন পর ৭ জানুয়ারি শুরু হলো পুলিশের প্রতিশোধ। দুই হাজার সেনা কাছাকাছি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযান শুরু করে। বারোটি গ্রাম ঘেরাও করে তছনছ করে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, চারিদিকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে অনেক গ্রামবাসীকে। নারী এবং শিশুদের ওপরও নির্যাতন করে।

ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নার্সদের সাথে অসুস্থ ইলা মিত্র

অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর সাথে তীর ধনুকে সজ্জিত সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলিম কৃষকদের পক্ষে বেশিক্ষণ যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামবাসী পিছপা হতে শুরু করেন। যে যেদিক পারলেন গা ঢাকা দিলেন। রমেন্দ্র মিত্র ও মাতলা মাঝি পালিয়ে ভারতে চলে যান। এরপর ৭ জানুয়ারী ইলা মিত্র গ্রেফতার হলেন। তিনি কিভাবে গ্রেফতার হলেন এবং তারপর তাঁর উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার বর্ণনা শুরুতেই দেয়া হয়েছে।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হকের নির্দেশে ইলা মিত্রের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। এই টিমের সুপারিশে বলা হয়, 'ইলা মিত্র নানা ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ড়। এসবের চিকিৎসা পূর্ব-বাংলায় সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী এই সুপারিশের ভিত্তিতে নির্দেশ দেন, 'নাচোল হত্যা মামলার অন্যতম সাজাপ্রাপ্ত আসামী ইলা মিত্রকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেয়া হলো।' কোলকাতা মেডিকেল কলেজে দীর্ঘ আটমাস চিকিৎসাধীন ছিলেন ইলা মিত্র।

স্বামী রমেন মিত্রের সাথে

এরপর শুরু হয় ইলা মিত্রের জীবনের নতুন অধ্যায়। সুস্থ হয়ে তিনি কোলকাতা সিটি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ইলা মিত্র পশ্চিম বঙ্গের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন সময় কারাবরণ করেছেন। বংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন।

ইলা মিত্র বেশ কয়েকটি র শ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তিনি বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ইলা মিত্র কলকাতায় স্বামী রমেন্দ্র মিত্র, একমাত্র পুত্র রণেন মিত্র, পুত্রবধু ও নাতি ঋতেনকে নিয়ে জীবনের শেষ সময় কাটিয়েছেন। উপমহাদেশের এই সংগ্রামী মহিয়সী নারী ৭৭ বছর বয়সে ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। ■

মূল লেখক - খাদিজা খানম

জুয়েল আইচ

জুয়েল আইচ

১৯৮১ সালের পহেলা জুলাই আমেরিকার যাদু শিল্পী সম্মেলনে যোগ দিতে গেছেন তিনি। বস্টনের নোগান বিমানবন্দরে নামার পর কাস্টমস কর্মকর্তা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কত ডলার সঙ্গে এনেছো? ভাবখানা এমন যে, বাংলাদেশের মতো গরিব দেশ থেকে কেউ আমেরিকায় কিছু নিয়ে আসে না, কেবল নিয়ে যায়। তিনি বললেন, আমি একজন বাঙ্গালি যাদুকর। ডলার আমার জন্য কোনো সমস্যাই না। কাস্টমস কর্মকর্তা উত্তরে বললো, ওসব তোমরা মঞ্চেই পারো, এখানে ওসব চলবে না। এরপরই সে কিছু সাদা কাগজ টুকরো করে বললো, পারলে এগুলোকে ডলার বানাও দেখি। তিনি হাত বুলিয়ে টুকরো কাগজগুলোকে ডলার বানিয়ে দিতেই শুরু হলো হৈ চৈ। সাদরে সবাই তাঁর মালপত্র বহন করে তাঁকে বিমান বন্দরের বাইরে নিয়ে এলো।

সুনামধন্য এই যাদুশিল্পীর নাম জুয়েল আইচ। যাদুকে যিনি বিনোদন থেকে শিল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে পরিচিত ও সম্মানিত করেছেন। তিনি কেবল যাদু শিল্পীই নন; একাধারে বাঁশিবাদক, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ইত্যাদি নানা পরিচয়ে পরিচিত। এছাড়াও তাঁর আরেকটি পরিচয় রয়েছে- তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আর এই পরিচয়টিকেই তিনি সবচেয়ে মূল্যবান মনে করেন।

পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি উপজেলার সমদেকাঠি গ্রামে জুয়েল আইচ ১০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে সমদেকাঠি গ্রামেই। সেই সুবাদে সমদেকাঠি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরে তিনি পিরোজপুর শহরে চলে আসেন। সেখানকার সরকারি হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি এবং স্থানীয় কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। পরবর্তীতে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এছাড়াও শিক্ষকতার সুবাদে তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে বিএড কোর্স সমাপ্ত করেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ঊর্মি লোহানী
শেখ রফিক

সম্পাদক
মৌরী তানিয়া

প্রকাশক
গুণীজন কর্মসূচী, ডি.নেট

মুদ্রণে
পাথওয়ে

অলংকরণ
মোঃ শাহজাহান কাজী

যোগাযোগ
৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.gunijan.org.bd
ফোন ঃ +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০২৯১৩১৪২৪
+৮৮০১৮১৪৬৫২৪৯৬-৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০২৮১৪২০২১

ছেলেবেলা থেকে বাবার আঁকাআঁকি দেখে জুয়েল আইচের আকর্ষণ জন্মে চিত্রশিল্পের প্রতি। এছাড়া তখন গ্রামের মেলায় বাঁশি দেখে এবং বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বেদেদের বাঁশি বাজানো দেখে তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল বাঁশি বাজনোর প্রতি। তবে যাদুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন। কারো যাদু দেখে নয়, কেবল বই পড়েই যাদুর প্রতি মোহাবিষ্ট হন তিনি। ছোটবেলা থেকেই যাদুর প্রতি একটা অন্যরকম টান অনুভব করতেন। বন্দে আলী মিয়ার 'রূপকথা' তাঁকে টেনে নিয়ে যেত যাদুর দেশে। যাদুর পাশাপাশি আঁকাআঁকি এবং বাঁশিটাকে এখনো ধরে রেখেছেন তিনি।

বাংলাদেশে যাদুর সম্রাট হিসেবে পরিচিত এই গুণী শিল্পী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ৯ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। জুয়েল আইচ যখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র তখন শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তারুণ্যের রক্ত টগবগ করছে তাঁর শরীরে। উপলব্ধি করলেন পাকিস্তানের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে হলে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাই জীবনের মায়া ছেড়ে নেমে পড়লেন

জুয়েল আইচ

হিংস্র হায়ানাকে বধ এবং দেশকে শৃংখলমুক্ত করার সংগ্রামে। পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানার পেয়ারাবাগান নামক স্থানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে হঠাতে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন তিনি। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানী বাহিনীর ওপর।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কখনো গেরিলা যুদ্ধে আবার কখনো সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়ে তিনি দেশের জন্য স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন। যুদ্ধের সময় নিজের জীবন রক্ষা পেলেও পাক হানাদার এবং তাদের দোসরদের হাতে সহায় সম্বল সবই হারান তিনি। যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় নতুন করে আবার জীবন শুরু করেন। স্বাধীনতার গৌরব ছাড়া তখন তাঁর আর কিছুই ছিল না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ রাজধানী ঢাকার দিকে ছুটতে শুরু করল। জুয়েল আইচ করলেন বিপরীত কাজটি। তিনি ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন গ্রামে। তিনি মনে করেন শিক্ষার অভাবই গ্রাম ও শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের প্রধান কারণ। শিক্ষার বিষয়টা শহরের চেয়ে গ্রাম থেকেই সবচেয়ে ব্যাপকভাবে আরম্ভ করা উচিত বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তাই শিক্ষকতা দিয়েই কর্মজীবন শুরু করেন জুয়েল আইচ।

কিন্তু ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘটে এক মারাত্মক দুর্ঘটনা। স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একদল ডাকাত তাঁর বন্ধু নিটুল করের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ওই বন্ধুর বাড়িতেই ছিল জুয়েল আইচের যাদুর সমস্ত সরঞ্জাম, বইপত্র। একাত্তরের পরে মাত্র ছ'বছরের মাথায় তিনি দ্বিতীয়বারের মত সর্বস্ব হারান। এরপর শিক্ষকতা ছেড়ে ঢাকায় ফিরে এসে নিজেকে

জুয়েল আইচ

জড়ালেন যাদু শিল্পে। তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে লাগল টেলিভিশনে, মঞ্চে, দেশে ও বিদেশে।

১৯৭৯ সালে গাইবান্ধায় তাঁর একটি যাদু প্রদর্শনীতে মজার একটি ঘটনা ঘটে। সেটি হলো-১৯৭৯ সালে গাইবান্ধার বি.ডি. হলে জিভ কেটে আবার জোড়া লাগানোর যাদু প্রদর্শনী চলছে। মিডিয়ামের নাক, চোখ, জিভ সমস্ত মুখমণ্ডল দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত দর্শকরা (যাদের মধ্যে ডাক্তার ও মেডিকেলের ছাত্ররাও ছিলেন) নিথর হয়ে পড়তে লাগলেন। পরে যখন জিভটা কেটে ডাক্তারদের হাতে দেয়া হলো তখন হলের অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এই শো'টি ব্যাপক প্রশংসিত হল। এক পর্যায়ে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও মেয়েদের স্কুল থেকে মেয়েদের জন্য এই প্রদর্শনী করার অনুরোধ জানানো হলো। অবশেষে আয়োজন করা হলো প্রদর্শনীর। অনুষ্ঠানের দিন জুয়েল আইচ বেশ চিন্তায় পড়লেন, পুরুষরাই যেখানে এ দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে যায় মেয়েদের অবস্থা না জানি কি হয়। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ব্যাপারটি মারাত্মক আকার ধারণ করবে। অনুষ্ঠান শুরু হল। সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করছে। জিভ কাটার পর সবাই বেশ জোরে হাততালি দিল। জুয়েল আইচ ভাবলেন, ব্যাপার কি? ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের স্নায়ুর জোর দেখছি বেশি। অনুষ্ঠান শেষে যখন অনেকে মঞ্চে অটোগ্রাফ নিতে এলো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জিভ কাটার এ দৃশ্য দেখে পুরুষরা পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যায়। আপনারা যে একটুও ভীত হননি? সঙ্গে সঙ্গে তারা দলবেঁধে বলে উঠলো, আপনার এই ভয়াবহ ম্যাজিকটির কথা আমরা সবাই আগে থেকেই শুনেছিলাম। তাই ওই দৃশ্য আসার আগেই আমরা সবাই চোখ বন্ধ করে ফেলি। শেষ হবার পর আমরা চোখ খুলে হাততালি দিয়েছি।

দেশের প্রয়োজনে জুয়েল আইচ ১৯৭১ সালে কোমল তুলি, বাঁশি আর যাদু দন্ড ছেড়ে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। তেমনি সমাজের প্রয়োজনে ডেংগু জ্বরের প্রকোপ যখন চরমে তখন তিনি রাজপথে নেমে এসেছেন। অংশ নিয়েছেন ডেংগু প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা অভিযানে। তাছাড়া ধূমপান বিরোধী অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি যুক্ত ছিলেন 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি (আধুনিক)'-এর সাথে। তাঁদের এ অভিযানের প্রেক্ষিতে সরকার সিগারেটের প্যাকেটে "সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" কথাটি লেখার নিয়ম চালু করে। বর্তমানে এসিড সন্ত্রাস বিরোধী প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে যুক্ত রয়েছেন এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশনের (এএসএফ) সঙ্গে। এছাড়াও পরিবেশ রক্ষার সংগ্রামে 'পরিবেশ আন্দোলন' এবং মাদক বিরোধী অভিযান 'মাদককে না বলো'-এর সঙ্গে জুয়েল আইচ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এখানেই তিনি সমাপ্তি টানেননি। মৃত্যুর পরও

জুয়েল আইচ

কিভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা যায় সেই ভাবনায় মরনোত্তর দেহ দান করেছেন তিনি। গড়ে তুলেছেন মানব কল্যাণে মরনোত্তর দেহদাতা সমিতি। তিনি এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

যাদুর উপর কোনো একাডেমিক শিক্ষা না নিয়েও নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এতদূর এগিয়েছেন জুয়েল আইচ। তরুণ প্রজন্মের অভাবটা তাই তাঁর কাছে সহজেই অনুভূত হয়। আর তাই ভবিষ্যতে একটি ম্যাজিক একাডেমি খোলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এখন তিনি এ ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই গুণী শিল্পী বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৫ সালে জুয়েল আইচ বিপাশার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির এক মেয়ে খেয়া আইচ। ■

মূল লেখক ঃ সাদেক হোসেন

রাবেয়া খাতুন

রাবেয়া খাতুন

'রাবুর হাতের লেখা পত্রিকা অফিসের পরপুরুষেরা দেখে, এজন্য আমাকে গঞ্জনা সহিতে হয়' এরকম একটি চিঠি একদিন এসে হাজির রাবু অর্থাৎ রাবেয়া খাতুনের বড় বোনের শ্বশুর বাড়ি থেকে। সময়টা ১৯৪৮-৪৯ সাল। রাবেয়া খাতুনের দু'চারটে গল্প ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কাগজে ছাপা হয়েছে। কিশোরী রাবেয়ার চোখে তখন স্বপ্ন লেখক হবার। স্বপ্নটা যখন বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে, তখন হুট করে এমনি একটা চিঠি এসে তাঁকে কি দমিয়ে দিতে পেরেছিলো? না পারেনি, মা-বাবার হাজারো আপত্তির দেয়াল টপকে সেদিনের রাবু আজ রাবেয়া খাতুন হতে পেরেছেন। সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি আজ আমাদের দেশের খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন।

রাবেয়া খাতুনের জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তৎকালীন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে মামার বাড়ি পাউসার গ্রামে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রামে। বাবা মৌলভী মোহাম্মদ মুল্লুক চাঁদ, মা হামিদা খাতুন, বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে আর দাদা ছিলেন শখের কবিরাজ। রাবেয়া খাতুনের জন্ম নিয়ে একটি মজার ঘটনা আছে- তাঁর জন্মের সংবাদটা শুনে তাঁর বাবা একসঙ্গে খুশি হয়েছিলেন আবার দুঃখও পেয়েছিলেন। রাবেয়া যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর বাবা ছিলেন তাঁর নানা বাড়িতে। সেকালে জামাইরা পিঠে খাবার দাওয়াত পেতেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। ঘটা-করা ব্যাপার ছিল সেটা। তাঁর বাবা আমন্ত্রিত হয়ে অফিস থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে খুশি মনে দাওয়াত খেতে গেলেন। বাবা গেলেন বৃহস্পতিবার আর রাবেয়া খাতুন জন্ম নিলেন শুক্রবার সকালে। তাই তাঁর বাবার আর থাকা হলো না। শ্বশুর বাড়ির নানারকম পিঠে-পুলি এবং আরও মজার মজার খাবার ছেড়ে চলে এলেন তিনি। রাবেয়া খাতুনের জন্মের খবর শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন কিন্তু শ্বশুর বাড়ির খাবার-দাবার ছেড়ে চলে আসতে হবে ভেবে মনও খারাপ হয়েছিল তাঁর। সেই সময় কন্যাসন্তান জন্মালে পরিবারের লোকজন খুশি হতো না। কিন্তু রাবেয়া খাতুনের বেলায় হয়েছে উল্টো। তাঁর জন্মের খবর শুনে তাঁর পরিবারের লোকজন খুব খুশি হয়েছিলেন।

পুরান ঢাকার রায় সাহেব বাজারের অলি-গলিতে ও অন্যান্য শহরে কেটেছে রাবেয়া খাতুনের শৈশবকাল। মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়ি গিয়েও বেড়াতেন পরম আনন্দে। রাবেয়ার কবিরাজ দাদা তাঁদেরকে প্রতিমা দেখার জন্য নৌকা করে নিয়ে যেতেন। ষোলঘর থেকে শ্রীনগর যাতায়াত বড় কষ্টের। এমন কিছু দূরে নয়, কিন্তু পুরো তল্লাটের পানি দখল করে থাকতো কচুরি পানায়। এই পানা ঠেলে প্রতিমা দেখতে যাওয়াটা ছিল খুব কষ্টের। তাঁর কাকারা বলতেন, আধখানা প্রাণ নাকি বেরিয়ে যেতো। কাকাদের শত কষ্ট হলেও তাঁরা কিন্তু খুব মজা পেতেন। তাঁর দাদা ধুতির প্রান্ত কিংবা আদ্দির পাঞ্জাবির পকেট থেকে দু' পয়সা এক পয়সা করে তাঁদের হাতে দিতেন ইচ্ছামত খরচ করার জন্য। তখনকার দিনে এই দু'এক পয়সা দিয়ে কিন্তু অনেক জিনিস কেনা যেত। রাবেয়া খাতুন তাঁর দাদুর দেওয়া এই পয়সা দিয়ে অনেক খেলনা কিনতেন। পুতুলের জন্য ছিল রাবেয়ার একচোখা আসক্তি। ছোটবেলায় একটু বেশি চঞ্চল ছিলেন বলে মার বকুনী খেতে হতো খুব।

বড় ছেলে ফরিদুর রেজা সাগরের সঙ্গে রাবেয়া খাতুন, জাফলং-এ

তাঁর বাবা ছিলেন মাছ ধরার ওস্তাদ। তাঁর এই মৎস্য শিকারের সঙ্গে থাকতেন রাবেয়া। নৌকা নিয়ে তাঁরা মাছ ধরতে যেতেন। কিন্তু চুপচাপ নৌকার খোলে পুতুলের মতো বসে থাকতে পারতেন না রাবেয়া। প্রায়ই নৌকা নাড়াচাড়া দিয়ে বিস্তর বকুনি খেতেন বাবার হাতে। বাবা বকা দিতেন ঠিকই কিন্তু মাছ ধরার সময় আবার তাঁকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কারণ তিনি থাকলে নাকি মাছ ঘন ঘন টোপ ফেলে!

রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে হওয়ায় স্কুলের গন্ডির পর তাঁকে কলেজে যেতে দেয়া হয়নি। স্কুলে মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কারণ সমাজের প্রচলিত নিয়ম ভেঙে মেয়েরা তখন স্কুলে আসতে পারতো না।

রাবেয়া খাতুন এক সময় শিক্ষকতা করেছেন। সাংবাদিকতার সঙ্গেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। ইত্তেফাক, সিনেমা, খাওয়াতীন পত্রিকা ছাড়াও তাঁর নিজের সম্পাদনায় বের হতো 'অঙ্গনা' নামের একটি মহিলা মাসিক পত্রিকা। বর্তমানে লেখালেখির কাজে নিবেদিত রয়েছেন তিনি।

১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই রাবেয়া খাতুনের বিয়ে হয়। স্বামী-এটিএম ফজলুল হক (চিত্র পরিচালক)। ফরিদুর রেজা সাগর, কেকা ফেরদৌসী, ফরহাদুর রেজা প্রবাল ও ফারহানা কাকলী এই চার সন্তানের জননী তিনি।

শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন থেকে জড়িত। তিনি বাংলা একাডেমীর কাউন্সিল মেম্বার, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের গঠনতন্ত্র পরিচালনা পরিষদের সদস্য, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জুরীবোর্ডের বিচারক, শিশু একাডেমীর কাউন্সিল মেম্বার ও টেলিভিশনের 'নতুন কুড়ি'র বিচারক। এছাড়া তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

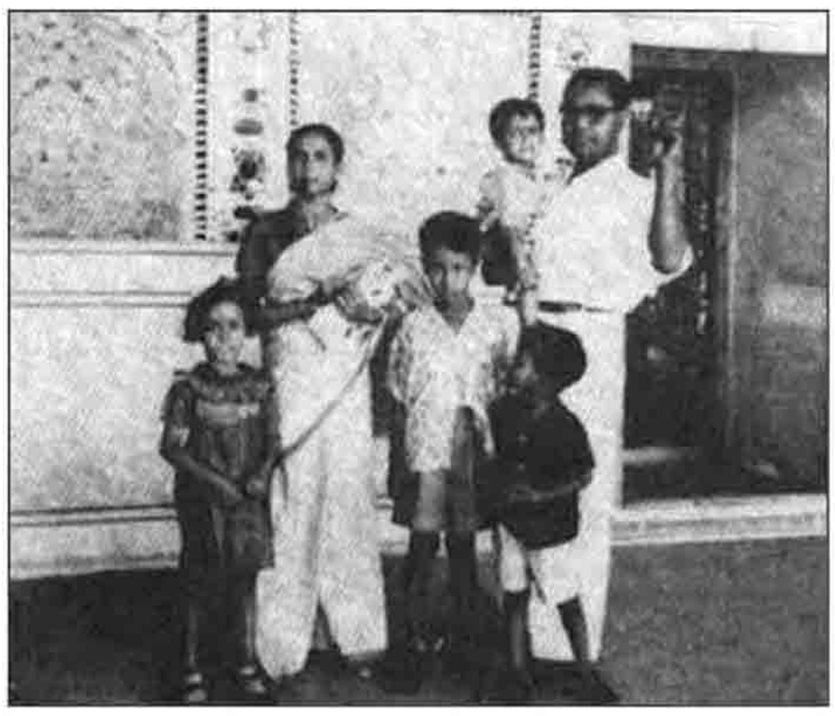

লাহোর দূর্গে রাবেয়া খাতুনের গোটা পরিবার

রাবেয়া খাতুন ১২-১৩ বছর বয়স থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। রাবেয়া খাতুনের লেখার হাতে খড়ি হয় উপন্যাস দিয়ে। তাঁদের বাড়ির নিয়ম ছিল সপ্তাহে দু'টো বায়োস্কোপ বা টকি সিনেমা দেখা। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী তৈরি হতো সম্ভবত সেই বায়োস্কোপ বা টকি সিনেমার কাহিনীকে কেন্দ্র করে। ভেতরে তাঁরই আঁকা ছবির ক্যাপশন থাকত। প্রথম উপন্যাসের নাম ছিল 'নিরাশ্রয়া', পরে 'বিদায়', 'অশোক-রেবা' এই ধরনের নাম। কিন্তু এই উপন্যাসগুলো কখনও গ্রন্থ আকারে বের হয়নি। ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকের তলায় গল্পের বই লুকিয়ে রাখতেন তিনি। আর এটি দেখে তাঁর মা ভীষণ রেগে যেতেন। এছাড়া তিনি যখন গল্প লিখতে বসতেন তখনও তাঁর মা রেগে যেতেন খুব। কারণ সব মায়ের মতো তাঁরও স্বপ্ন মেয়ে ক্লাসে ফার্স্ট হবে। সেসময় তাঁদের পড়াশুনা করানো হতো মূলত একটি ভালো বিয়ে দেয়ার জন্যই। কিন্তু তাঁর মা যেমনটি চাইতেন রাবেয়া ছিলেন ঠিক তাঁর উল্টো। কারণ পড়াশুনায় তিনি মোটেই ভাল ছিলেন না। কোন রকমে টেনেটুনে পরীক্ষায় পাশ করতেন তিনি। তাঁর মা এজন্য দায়ী করতেন বাইরের বই পড়া ও গল্প লেখার নেশাকে।

রাবেয়া খাতুন ছেলেবেলায় লেখালেখির পাশাপাশি গান গাইতে খুব ভালবাসতেন। ছোটবেলায় গান শিখতেন তিনি কিন্তু নিয়মিত রেওয়াজ করতে পারতেন না। কারণ সেসময় গানকে ভালো চোখে দেখা হতো না। তাঁদের বাসাটি ছিল মসজিদ লাগোয়া। তাই হারমোনিয়াম বাজানো ছিল নিষিদ্ধ। প্রায় দিনই খালি গলায় গাইতেন তিনি। যেদিন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামতো সেদিন হারমোনিয়ামের সঙ্গে প্রাকটিস করতেন। তাঁর বাবা বাজাতেন, তিনি আর তাঁর ছোট বোন সুফিয়া গাইতেন।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যুগের দাবী'তে ছাপা হয় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'প্রশ্ন'। ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই 'মধুমতী' প্রথম বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। এরপর প্রকাশিত হয় 'সাহেব বাজার', 'অনন্ত অন্বেষা', 'রাজারবাগ' 'শালিমারবাগ', 'মন এক শ্বেত কপোতী', ফেরারী সূর্যসহ আরও অনেক গ্রন্থ। এছাড়া তিনি লিখেছেন বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী। রাবেয়া খাতুনের লেখা কাহিনী নিয়ে চারটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

রাবেয়া খাতুন ও ছোট বোন সুফিয়া, তাঁর লেখার প্রথম পাঠক

ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন 'দু:সাহসিক অভিযান', 'সুমন ও মিঠুন গল্প', 'তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা', একাত্তরের নিশান, দূর পাহাড়ের রহস্য, লাল সবুজ পাথরের মানুষসহ অনেক উপন্যাস। রাবেয়া খাতুন জীবনে অনেক বড় বড় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ■

মূল লেখক ঃ কামরুন ঝুমুর

রাবেয়া খাতুন ষোল বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে

ছোট ছেলে ফরহাদুর রেজা প্রবালের সঙ্গে রাবেয়া খাতুন

গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ১ সংখ্যা : ২, জুন ২০১০

শামসুর রাহমান

শামসুর রাহমান

শৈশবে তাঁর দেখা প্রথম চিত্রশিল্পী বাবুবাজারের নঈম মিঞা। ছেলেবেলায় স্কুলে যাওয়ার পথে নঈম মিঞার দোকানের সামনে দাঁড়াতেন তিনি। তুলি দিয়ে কাঁচের ওপর ছবি আঁকতেন নঈম মিঞা। সেগুলো বিক্রি করতেন। নঈম মিঞার কাছে ছবি আঁকার পাঠ শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু একদিন নঈম মিয়া ছোট বালকটিকে ধমক দিয়ে বিদায় করে দেন। কারণ জীবনের প্রথম শিল্পের ওস্তাদ নঈম মিঞা চাননি শিল্পের নেশায় এই শিশুর জীবনও তার মতো খুকখুক কাশির ও ধুকধুকে কষ্টের হয়ে উঠুক। নঈম মিঞার মতো পরবর্তী জীবনে তাঁর বাবাও চাননি তাঁর ছেলে কবি হোক। কবিতা লিখলে জীবনে বিত্তবৈভবে সফল হওয়া যায় না, তাই অভিভাবকরা কেউ কবি হতে তাঁকে উৎসাহিত করেননি।

কিন্তু নঈম মিঞা এবং অভিভাবকদের কাছ থেকে উৎসাহ না পাওয়ায় তাঁর সৃষ্টিশীল মন থেমে থাকেনি। আর তাইতো তিনি হয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম কবি। বাংলাদেশের অন্যতম ও সবার প্রিয় এই কবি হচ্ছেন শামসুর রাহমান।

১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর বুধবার সকালে ঢাকা শহরের মাহুতটুলির এক সরু গলির ভিতর নানার কোঠাবাড়িতে শামসুর রাহমানের জন্ম। তাঁর ডাক নাম বাচ্চু। শামসুর রাহমানরা চার ভাই ও ছয় বোন।

সাহিত্যচর্চার বালাই নেই এমন এক পরিবারে বেড়ে উঠেছেন কবি শামসুর রাহমান। পরিবারের কারো সঙ্গীত, চিত্রকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। তবে পুরনো ঢাকার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ কাওয়ালি ও মেরাসিনের গানের সাথে পরিচয় হয়েছিল অতি শৈশবেই। পরিবারের সব লোকজন উপলক্ষ পেলেই কাওয়ালির আয়োজন করত।

শৈশবে কবি তাঁর শিল্পের ক্ষুধা মিটিয়েছেন সস্তা হিন্দি সিনেমা দেখে। বাবা কিছুদিন সিনেমা হলের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড ও ঢাকা তাজমহল সিনেমা হলের অংশীদার। বৈমাত্রেয় মেজো ভাই আমিনুর রাহমান চৌধুরী ছিলেন তাজমহল সিনেমা হলের অপারেটর। মেজো ভাই আমিনুর রাহমান চৌধুরীর ঘরের মায়া ছিল না। উড়নচণ্ডী সেই ভাই নৌবাহিনীর চাকরি নিয়ে সমুদ্রে ও বিদেশ-বিভূঁইয়ে জীবন কাটিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' থেকে 'ভারততীর্থ' কবিতাটি আপনমনেই নিজের মতো আবৃত্তি করতেন কবির মেজো ভাই। আবৃত্তিকারের গভীর আন্তরিকতার কারণে কবির ছোট্ট মনে গেঁথে গিয়েছিল সেই কবিতা।

শামসুর রাহমানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ পোগজ স্কুলে। ১৯৩৬ সালে এ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন তিনি। এই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় ছোট বোন নেহারের মৃত্যুতে একটি কবিতা লেখেন তিনি। তাঁর লেখা জীবনের প্রথম এই কবিতা শুনে তাঁর মা কেঁদেছিলেন খুব।

১৯৪৫ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। স্নাতক সম্মান পড়া শেষ বছর পর্যন্ত চালিয়ে গেলেও পরীক্ষায় অবতীর্ণ হননি। ১৯৫৩ সালে পাস কোর্সে স্নাতক পাশ করেন।

২০০৬ সালে পরিবারের সদস্যদের সাথে কবি

স্নাতকোত্তর ভর্তি হয়ে প্রথম পর্ব কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু শেষ পর্বের পরীক্ষায় আর বসা হয়নি তাঁর।

১৯৫৫ সালের ৮ জুলাই লেখাপড়া মাঝপথে অসমাপ্ত রেখেই আত্মীয়া জোহরা বেগমের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। শামসুর রাহমান ও জোহরা বেগম দম্পতির পাঁচ সন্তান।

১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা ছাপা হয়। সেই কবিতার নাম 'তারপর দে ছুট'। এরপর লিখেছেন বহু কবিতা। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাধিক।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবির কলম সবসময় রুখে দাঁড়িয়েছে। আর সেজন্য তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। এই শত্রুরা তাঁর প্রতি মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছে। তাঁকে হত্যা করার জন্য বাসায় হামলা করেছে। এতকিছুর পরও কবির কলম থেমে থাকেনি, তিনি তাঁর বিশ্বাসের জায়গায় ছিলেন অনড়।

১৯৬৭ সালের ২২ জুন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্প্রচার নিষিদ্ধ করেন। শামসুর রাহমান তখন

স্ত্রীর সাথে কবি ভারতের কুতুব মিনারের সামনে

সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তানে' কর্মরত। পেশাগত অনিশ্চয়তার তোয়াক্কা না করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর হাসান হাফিজুর রহমান, আহমেদ হুমায়ুন, ফজল শাহাবুদ্দীন ও শামসুর রাহমান।

১৯৭০ সালের ২৮ নভেম্বর ঘূর্ণিদুর্গত দক্ষিণাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় ও মৃত্যুতে কাতর হয়ে কবি লেখেন 'আসুন আমরা আজ' ও 'একজন জেলে'। মৃত ও দুর্গতদের দেখে এসে পল্টন ময়দানে এক মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন মৌলানা ভাসানী। ভাসানীর ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি লেখেন 'সফেদ পাঞ্জাবি' কবিতা। কবিতাটি 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'য় ছাপা হয় এবং পরে 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পরিবার নিয়ে চলে যান নরসিংদীর পাড়াতলী গ্রামে। এপ্রিলের সাত বা আট তারিখে পৌঁছেই তিনি লেখেন যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় আক্রান্ত ও বেদনামথিত কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'।

১৯৮৭ সালে স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে 'দৈনিক বাংলা'র প্রধান সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন কবি শামসুর রাহমান। এ সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা ঢাকায় থাকার মতো তখনো কোনো নিবাস ছিল না কবির, অর্থ উপার্জনের ছিল না কোনো বিকল্প রাস্তা। তাছাড়া তখন কবির ফুসফুসেও দেখা দিয়েছে সমস্যা। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড দুঃসময় কবির ব্যক্তিগত জীবনে। জাতীয় জীবনের দুঃসময়ে নিজের কথা ভুলে কবিতাকে অস্ত্র মেনে দুঃশাসন অবসানের আন্দোলন চালিয়ে গেলেন কবি। ১৯৮৭ থেকে পরবর্তী চার বছরের প্রথম বছরে 'শৃঙ্খল মুক্তির কবিতা', দ্বিতীয় বছরে 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা', তৃতীয় বছরে 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা' এবং চতুর্থ বছরে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কবিতা' লেখেন তিনি। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের অবসান ও গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা প্রত্যক্ষ করে ১৯৯১ সালে লেখেন 'গণতন্ত্রের পক্ষে কবিতা'।

শামসুর রাহমান ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি শামসুর রাহমান ১৯৫৭ সালে কর্মজীবন শুরু করেন অধুনালুপ্ত মর্নিং নিউজের সহ-সম্পাদক হিসেবে। ১৯৫৮ সালে সাংবাদিকতা ছেড়ে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে। পরে আবার ফিরে আসেন উর্ধ্বতন সহ-সম্পাদক হিসেবে মর্নিং নিউজ পত্রিকায়। মর্নিং নিউজে ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৬৪ সালে পত্রিকা জগতে নতুন আসা সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তানে' অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বাংলা'য় যোগ দেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে। দীর্ঘ ১৩ বছর কাজ করার পর ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি 'দৈনিক বাংলা' এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ সময় 'একটি মোনাজাত' কবিতা লেখার কারণে সরকারের রোষানলে পড়েন তিনি।

সাংবাদিকতার বাইরে তিনি প্রথম সম্পাদনা করেন লিটল ম্যাগাজিন 'কবিকণ্ঠ'। ১৯৫৬ সালে তিনি ছিলেন এটির সম্পাদকমণ্ডলির সম্পাদক। ১৯৮৭ সালে ক্ষণজীবী 'অধুনা' সাহিত্যপত্রের সম্পাদক ছিলেন তিনি। 'সাপ্তাহিক মূলধারা'য় ১৯৮৯ সালে প্রধান সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন তিনি এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত 'মূলধারা'র সাহিত্য সহযোগী পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯৬ সালে বাংলা একাডেমীর সভাপতি নিযুক্ত হন। এই মহান কবি জীবনে অনেক বড় বড় পুরস্কারে

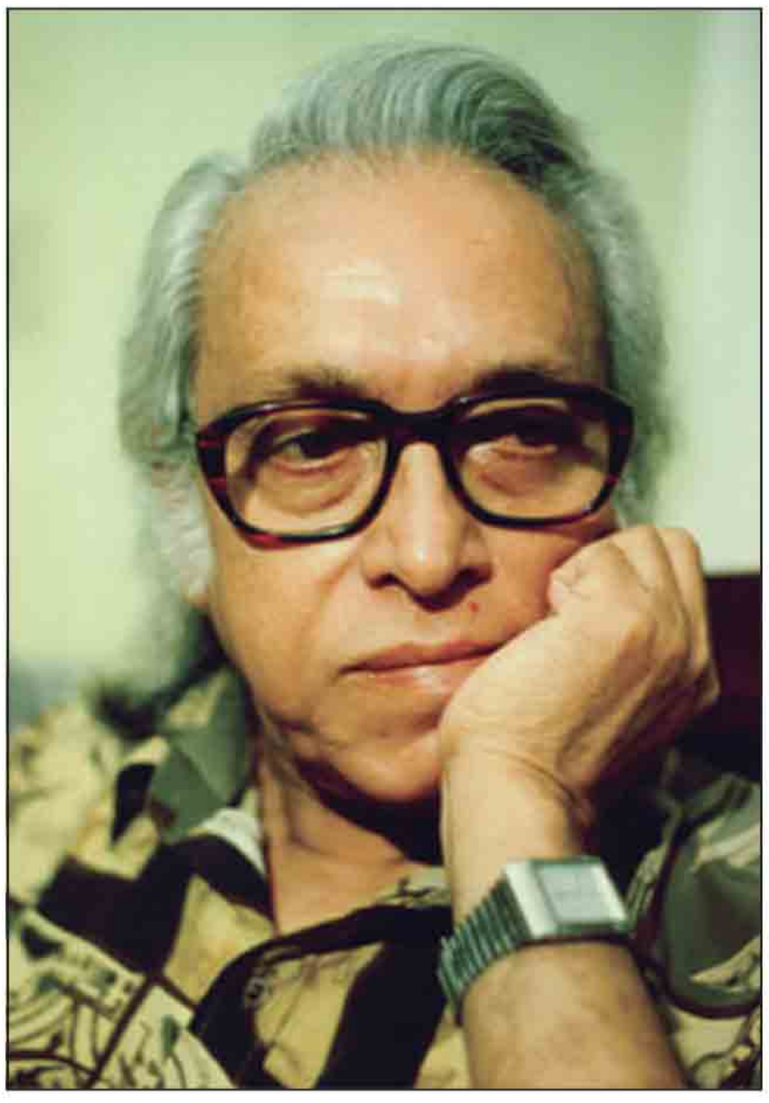

বিশেষ মুহূর্তে সৃজনশীল ভাবুক কবি শামসুর রাহমান

ভূষিত হয়েছেন।

২০০৬ সালের ১৭ আগষ্ট আমাদের সবার প্রিয় কবি শামসুর রাহমান এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবেন সবসময়। ■

মূল লেখক - ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ